চিত্তপ্রসাদ

চিত্তপ্রসাদের জন্মশতবর্ষে আমরা পুনঃপ্রকাশ করছি গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধার্ঘ। শিল্পী সোমনাথ হোড় এই লেখাটি বারোমাস পত্রিকার জন্যে লেখেন এবং প্রথম প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৭৮ সংখ্যায়। শ্রদ্ধেয় কার্টুন-রসিক শুভেন্দু দাশগুপ্তর সহায়তায় লেখাটি প্রকাশ করা সম্ভব হল।

সম্ভবত ১৯৪৩ সালে চিত্তপ্রসাদের কাছে আমার ছবি আঁকার প্রথম পাঠ। তখন জানতাম না, পরে জানতে পারি ওঁর আসল বাড়ি মেদিনীপুরে কিন্তু বড় হয়েছেন চট্টগ্রামে। বাউণ্ডুলে ছবি-আঁকিয়ে ছিলেন; কোনো এক আড্ডা থেকে কম্যুনিস্ট কর্মী প্রয়াত পূর্ণেন্দু দস্তিদার গণ-আন্দোলনে চেটে আনেন। সেই যে নতুন জীবন শুরু হল – চিত্র-মাধ্যমে, তা আর পশ্চাদমুখী হল না।

৪৩-এর মন্বন্তর ভুলিনি। চিত্তপ্রসাদকে দেখতাম, নাওয়া নেই খাওয়া নেই ড্রয়িং খাতা, পেন্সিল, আর কালি তুলি নিয়ে সমানে স্কেচ করে চলেছেন। অভুক্ত, রোগাক্রান্ত, মরণোন্মুখ অসংখ্য শিশু, নর-নারী। তারা আমাদের গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। আমরা অর্ধভুক্ত ছিলাম। অভুক্তদের উপস্থিতি সহনীয় হয়ে উঠেছিল। কিচেনে রিলিফ দেয়া ছাড়া খুব বেশি কিছু করার ছিল না। হা-পা-ফোলা কঙ্কালসার মূর্তিগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে লাগল – চারিদিকে শুধু দুঃখ, দুর্দশা আর হতাশা। চিত্তপ্রসাদের ছবিগুলি হঠাৎ ছুরির ফলা হয়ে কেটে চলল। তারা প্রতিবাদের রূপ নিল। প্রতিটি রেখা চিৎকার করে বলে উঠল – 'তোমরা, তোমরাই এর জন্য দায়ী; কই বাঁচাতে ত পারলে না। চেষ্টা করেছ কি?' প্রয়াত জয়নূল আবেদীন এবং চিত্তপ্রসাদের ছবিগুলি দর্শককে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যুগপৎ দংশন এবং বিচলিত করেছিল। আরো অনেকে এ সময়ে দুর্ভিক্ষের ছবি করেছেন। কিন্তু তার বেশিরভাগই দূর থেকে দেখা। মৃত্যুর মুখোমুখি সংলাপ নয়।

চিত্তপ্রসাদের এই সময়কার আরেকটি অবদান – কিছু গান। অনেকেই জানেন, চট্টগ্রামের নিজস্ব একটি কথ্যভাষা আছে। চিত্তপ্রসাদ এই ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন

এবং দুর্ভিক্ষের সময় এমন কিছু গান লিখেছিলেন – যা হয়েছিল তৎকালীন গণ-আন্দোলনের হাতিয়ার। এখানে একটি গানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

শুনরে অগো দেশবাসী, শুন যত নারী,
বহু দুঃখের শেষে আজুয়া (আজ) জীবন যারগৈ ছাড়ি।
সাতকানিয়ায় আছিল ঘর, সোয়ামী আছিল চাষি
আছিল চাইরগোয়া (চারটি) হালর বলদ, গোলাত্ (গোলায়) ধানরাশি।
গাইয়ত (গায়ে) আছিল অলংকার, পোয়া (ছেলে) আছিল বুকে
চাঁপা ফুলর বরণ তাহার, কতই বুলি মুখে।
ইত্যাদি ...–

হাজার হাজার মানুষ এই গান শুনতে শুনতে অশ্রুধারায় সিক্ত হত। ভাষা, ধ্বনি এবং আবেগের সংমিশ্রণে এগুলি হয়ে উঠেছিল অপূর্ব। চট্টগ্রামী অনেকে একই বিষয়ে কিছু কিছু গান লিখেছেন, কিন্তু চিত্তপ্রসাদের গানের মতো সেগুলি স্বচ্ছন্দ ও আবেগপূর্ণ হয়নি।

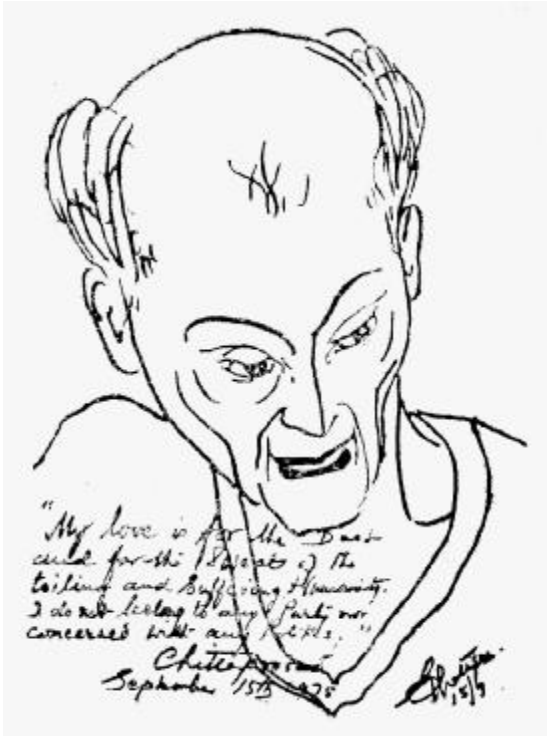

৫০-এর পরে রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে একান্তভাবে ছবি আঁকায় নিবিষ্ট হন। এটা অনিবার্য ছিল। জনজীবন থেকে ছবি আঁকার রসদ নিতেন। সেখানেই রইলেন, ওপর তেকে রাজনীতি ছবিতে ছাপাবার চেষ্টা করলেন না। পরবর্তী অধ্যায়ে যা কিছু এঁকেছেন – প্রায় সবই জীবনের জয়গান। আত্মপ্রত্যয় ছিল অগাধ। তাই কখনো দিশেহারা হননি। আপন জীবনীশক্তি ছবিতে প্রতিবিম্বিত। ওঁর ব্যবহার, কথা এবং লেখায় (ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে) হতাশার স্থান ছিল না।

কথাবার্তায় ও আচরণে খুবই রসিক এবং প্রাণচঞ্চল ছিলেন। যে-কোনো বিষণ্ন ম্লান পরিবেশকে মুহূর্তের মধ্যে সজীব করে তুলতেন। সময় পেলেই ওঁর কাছে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করতাম। কিন্তু পরবর্তীকালে বহুদিন ধরে তাঁর সঙ্গে সংযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘকাল বম্বেতেই কাটালেন, আত্ম-নির্বাসিত। কলকাতায় মাঝে মাঝে আসতেন। পরে তাও বন্ধ হয়ে গেল। চিঠি মারফত কিংবা লোক মারফত জানতে পেতাম – উনি ছবি আঁকছেন; জেলে, মুটে, মজুর কিংবা শিশু। সম্ভবত একবার মহাভারতের কিছু কিছু কাহিনীর চিত্ররূপও করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি দেখার সৌভাগ্য হয়নি। বহু নাচের পুতুলও তৈরি করেছিলেন

শুনেছি। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা মুগ্ধ। ওঁর কাজে বিদ্যালয়ের পালিশ ছিল না; থাকত শক্তি বিকীরণ – সরাসরি এবং মর্মভেদী। আগেই বলেছি, যখন রাজনীতিতে ছিলেন এবং যখন তা বর্জন করলেন – মাঝে কোনো ফারাক সৃষ্টি হলনা। কারণ ছবিত্বকে তিনি কখনো বর্জন করেন নি। পশ্চিমী শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারস্থ কখনো হননি – না এদেশে, না বিদেশে। তাই ভারতীয়ত্ব তাঁর ছবিতে স্পষ্ট। অথচ ভারতের চিত্রপটে তাঁর প্রায়-অনুপস্থিতি বিস্ময়কর। এই অনুপস্থিতি দুঃখের এবং ক্ষোভেরও। কত প্রকৃত অর্থে অ-শিল্পী তাঁদের চোখবেঁধানো অস্তিত্ব দিয়ে আবহাওয়া অম্লকষায় করে রেখেছেন কিন্তু চিত্তপ্রসাদ রইলেন বাইরে। এর ফলে আমরা তাঁকে আরো গুটিয়ে যেতে দেখলাম। অভিমান প্রায় শামুকের খোলসের আকার নিয়েছিল। বন্ধু-বান্ধবদের আন্তরিক সহানুভূতিকে করুণা সন্দেহে দূরে ঠেলে রাখতেন। শুনেছি শেষ জীবনে কঠোর দারিদ্র্য বরণ করেন; প্রায় স্বেচ্ছাবরণ বলা চলে। নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ কাছে ছিলেন এবং শেষ জীবনের দুঃখকষ্ট কিছুটা লাঘবের চেষ্টা করেছেন – তাঁরা নিঃসন্দেহে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন।

নন্দলালের অর্জুন-চিত্রের বৃষস্কন্ধ শার্দুল আকৃতি রূপ পেত চিত্তপ্রসাদের চেহারায়। সত্যই সুন্দর শক্তিমান পুরুষ। শুনেছি কোনো এক সময় হৃদয় বিনিময় হেতু গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল জীবনে। তারই ফলে চিরতরে কলকাতা ত্যাগ এবং সুরা-আশ্রয়। এই দুই কাঁটা বুকে নিয়ে দীর্ঘ অপেক্ষা এবং অন্তিম। কত পরিমাণ দুঃখ, শোক, হতাশা আত্মস্থ করে এই শিল্পী অপরকে জীবনের জয়গান শুনিয়েছেন – তার পূর্ণ উন্মোচন হলে সকলেই উপকৃত হব। কিভাবে হতে পারে আপনারাই ভেবে দেখুন।

চিত্র পরিচিতি : সমস্ত ছবিই চিত্তপ্রসাদের আঁকা। শুধু শিল্পী চিত্তপ্রসাদের প্রতিকৃতি এঁকেছেন তাঁর বোন গৌরী চট্টোপাধ্যায়।